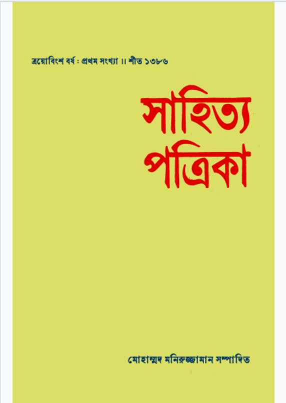

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল কাদির
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.2
Pages	26-42
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা

আবদুল কাদির

বাঙলা সাহিত্য-সমালোচনার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রণয়নের প্রয়াস এ-যাবত কোথাও হইয়াছে কি না, জানি না। এ-বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে যে-সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে বাঙলা ভাষায় সৃজনশীল সাহিত্য-সমালোচনার সূচনা-সূত্র নিরূপণ অনায়াসসাধ্য নহে। বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার সূত্রপাত হইয়াছে প্রথমতঃ পুস্তক-পরিচিতির মাধ্যমে।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় এবং ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) উহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। সেই কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য, কেরীর সহকারী রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২), কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান সহকারী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) এবং কলেজের শিক্ষক রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইলে পর, বাঙলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত মার্শম্যান-সম্পাদিত 'সমাচার-দর্পণ' (প্রথম প্রকাশ: ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মে শনিবার) পত্রিকায় বলা হয়:

> বঙ্গভাষায় রচিত ক্ষুদ্র এক গ্রন্থ অর্থাৎ নবদ্বীপাধিপতি রাজা ৶ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র-বিবরণ এই সপ্তাহে এখানে প্রকাশ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত ৶ প্রাপ্ত ডাক্তার কেরী সাহেবের অনুমতিক্রমে রচিত হইয়া ৩২ বৎসর পূর্বে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ....যে রাজা প্রথম বঙ্গদেশে ইউরোপীয়দের রাজ্য সংস্থাপন কার্যে অতি নিপুণ প্রযোজক ছিলেন, এবং যে রাজা তৎসময়ে অন্যান্য রাজাপেক্ষা ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক বৃত্তি প্রদান করেন, এই গ্রন্থে তাঁহার রীতি চরিত্র-বিষয়ক অশেষ বিশেষ রূপ-বর্ণনা আছে, এই প্রযুক্ত বোধ হয় যে, এই গ্রন্থ লোকেরদের সুপঠনীয় হইবে।
> [সমাচার-দর্পণ, ১৯ জুলাই ১৮৩৪, ৫ শ্রাবণ ১২৪১][১]

ইহা বিজ্ঞাপন-শ্রেণীর রচনা,—ঠিক পুস্তক-পরিচিতি নহে। সমাচার-দর্পণে এরূপ পুস্তক পরিচিতি যেমন পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় পত্রিকা-পরিচিতি। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখের 'সমাচার-দর্পণ' হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩৩) প্রবর্তিত ইয়ং বেঙ্গল দলের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার 'সম্পাদক' মহাশয়ের "প্রতি এই পরামর্শ" দেন যে, "এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে অথবা এতদ্দেশীয় লোকোপকারার্থে যে যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহার সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্শ্বে

প্রকাশ করেন।" কিন্তু রসিকচন্দ্র মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮)-সম্পাদিত "কলিকাতা নগরে প্রকাশিত অত্যুত্তম জ্ঞানান্বেষণ" সেই পরামর্শ আদৌ পালন করিয়াছিলেন কি না, তাহা বিশেষজ্ঞেরা বলিতে পারেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ব্রাহ্মসমাজের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১২৫০ সালের ভাদ্র মাসে তাঁহার আবির্ভাব-কাল হইতে ১২৬২ সালে তাঁহার অসুস্থতা-কাল পর্যন্ত প্রায় ১২ বৎসর সম্পাদনা করিয়াছিলেন; তাহাতেও কোনও পুস্তক-পরিচিতি বা সাহিত্য-সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, তাহাও সন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

কলিকাতায় ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটীর আনুকূল্যে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মুতাবিক ১২৫৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৬৮ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বা রহস্য-সন্দর্ভ বাহির হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের পর কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩০-১৮৭০) উহা সম্পাদন করেন। অধ্যাপক শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঙলা সমালোচনার বিকাশে বিবিধার্থ-সংগ্রহের ভূমিকা' নামক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে বলিয়াছেন:

> সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশাস্ত্র-সম্মত যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে দেশীয় সাহিত্য-বিচারের প্রচেষ্টা এই পত্রেই প্রথম দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির অনেক রচনার রসজ্ঞ সমালোচনা 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' প্রকাশিত হয়েছিল।[২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রণীত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) প্রণীত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'বেণী-সংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৬০) নাটক, টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩) প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) উপন্যাস, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-১২৯৪) প্রণীত 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্য, বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) প্রণীত গদ্যনিবন্ধ 'স্বপ্নদর্শন' (১২৬৫), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪) প্রণীত 'কৌরব-বিয়োগ' (১৮৫৮) নাটক, দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩) প্রণীত 'নীলদর্পণ' (ঢাকা, ১৮৬০) নাটক, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৫৯) প্রহসন, 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটক, 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) কাব্য, 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১) কাব্য ও 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১) কাব্য, দীননাথ ধর (১৮৩৯—?) প্রণীত 'কংসবিনাস' (১৮৬১) কাব্য প্রভৃতির যে-সমালোচনা 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' প্রকাশিত হয় তাহা এখনও "অনেক স্থলে প্রামাণ্য" বলিয়া "গৃহীত হওয়ার দাবী রাখে।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থিত হওয়ার পূর্বে কলিকাতায় বেথুন সোসাইটীতে পঠিত হইয়াছিল। এই রচনাটি সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' বলা হয়:

> যদিচ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য এই উভয় বিষয়ই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, পরন্তু, ফলতঃ এই প্রস্তাব সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়েই ব্যাপৃত আছে। ইহার দুই

> পত্র মাত্র সংস্কৃত ভাষার প্ররোচক, এবং তাহাতেও সংস্কৃতের গুণকীর্তন মাত্র আছে। ভাষার ধর্ম ও লক্ষণ বিষয়ে প্রায় কিছুমাত্র উক্ত হয় নাই।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিণী-উপাখ্যান' সম্বন্ধে বলা হয় :

> তাঁহার গ্রন্থটি সদ্ভাবের আকর, এবং সেই ভাবসকল মনোহর ভঙ্গীতে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিণী-উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় বলেন যে, তিনি কুন্তীর ভূম্যাধিকারী কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ও রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের "অনুরোধে কর্ণেল টড-বিরচিত 'রাজস্থান' পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ" করেন এবং "কাব্য সমাপ্তির পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি ভার্নাকুলার লিটারারী সোসাইটীর অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ-প্রদান পূর্বক অনুরোধ করাতে সেই কাব্য প্রকাশ" করেন। রঙ্গলাল তাঁহার কাব্যে বিশাখা-পয়ার ছন্দে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" উক্তি করিলেও উপসংহারে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে অকপট ইংরাজ-ভক্তি প্রদর্শনচ্ছলে বলিয়াছেন :

কি আছে এখন আর, দাসত্ব শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্বল শরীর মন, ম্রিয়মান হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ-মদে ॥

* * *

ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ বিভাবরী ভোর,
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপাবলে মানস-উদয়াচলে
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী-মাঝে সুখ সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ বারিদচয়
আর যেন বিষ না বরিষে ॥

এখানে রঙ্গলাল এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, এখন ম্রিয়মান হিন্দুগণ দাসত্ব শৃঙ্খল সার করিয়া দ্বেষ-মদে মত্ত হইলেও ভারতের বড় ভাগ্য, কেননা ইংরাজের কৃপাবলে তাহাদের দুঃখ-বিভাবরী ভোর এবং তাহাদের মানসলোক জ্ঞানভানুপ্রভায় প্রচারিত হইয়াছে; তাহাদের মনোভৃঙ্গ শান্তিতে ও সুখে মগ্ন হউক,—তাহাদের এই অবস্থায় বিদ্রোহ-মেঘ যেন আর বিঘ্ন না আনে! এ-সকল কথায় ১৮৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ের বাঙলার হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের বিদেশী ইংরাজের কৃপাপুষ্ট পরাধীনতা-প্রসাদ-পরিতুষ্ট স্বাধীনতা-যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবের বাস্তব ছবি অপ্রচ্ছন্ন; কিন্তু এই লজ্জাকর দাস্য-ভাবও সমালোচকের মনে হইয়াছে 'সদ্ভাব'; ইহাতে তাঁহাদের প্রভুপদলেহী প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী-মানসিকতার প্রতিফলনই পরিস্ফুট।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শূর-সুন্দরী' (১৮৬৮) কাব্যে পৃথ্বীসিংহের পত্নী 'নৌরোজের হাট' দেখিতে গিয়া দিল্লীশ্বর মহামতি আকবরের বক্ষে 'পদাঘাত' করিয়া হস্তে 'করবাল'

ধরিয়া তাঁহাকে 'গোলাম-পুত্র' 'শূকর-নন্দন' 'দুরাচার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে; তাহাতে এদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে রঙ্গলাল নিয়াছেন এক পুরোধার ভূমিকা।[৩] কিন্তু আধুনিক বাঙলার সৃজনধর্মী সাহিত্যে 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির সূত্রপাত করিলেও রঙ্গলাল তাহার 'ভূমিকা'য় বলেন যে, "ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতার প্রেম পরিহার পূর্বক", স্পষ্ট কথায়, দাশরথি রায়ের যমক-অনুপ্রাস-ক্লিষ্ট পাঁচালী ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের[৪] 'অশ্লীলতা'-দোষে দুষ্ট পদ্য প্রণয়নের প্রণালী পরিহার পূর্বক, "ইংলণ্ডীয় কবিতার বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা-কলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে"; এজন্যই তিনি সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেও ক্ষমার্হ। তাঁহার সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন :

> বাঙ্গালীর সাহিত্য-ইতিহাসে রঙ্গলালের মূল্য শুধু নূতন কবিতার নান্দী-পাঠক রূপেই নহে; প্রথম সাহিত্য-সমালোচক রূপে তাঁহার অগ্রগামী কৃতিত্ব স্মরণীয়। বীটন সোসাইটীতে পঠিত ('বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব', ১২৫৯ সাল) প্রবন্ধে এবং দুইখানি ('পদ্মিনী-উপাখ্যান' ও 'কর্মদেবী') কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রঙ্গলালের সমালোচনার মূল্য প্রকটিত। তৌলন সাহিত্য-সমালোচকের যোগ্যতাও তাঁহার ছিল।[৫]

কালীপ্রসন্ন সিংহ ১২৬৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যক 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের এক বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ করেন; তাহাতেই সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত পত্রিকাখানির প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

তাহার প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পরে, ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' আত্মপ্রকাশ করে। 'বঙ্গদর্শনে'র একটা বৈশিষ্ট্য ছিল 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'। ভবানীপুরের ব্রজমাধব শীল প্রকাশক-রূপে 'বঙ্গদর্শনে'র যে-বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাহাতে লেখকগণের নাম বলা হয়: দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশলাল রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার। আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) লিখিয়াছেন :

> ১২৮০ সালের বৈশাখ হইতে 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিমবাবুদিগের বাড়ী কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সঞ্জীব বসু কাঁটালপাড়াতেই প্রেস স্থাপিত করিলেন। ১২৮০ সালের কার্তিক মাস হইতে আমি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম।[৬]

বঙ্গদর্শনের 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে ১২৮০ সালের ভাদ্র-সংখ্যায় মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) প্রণীত 'জমীদার-দর্পণ' (১৮৭৩, চৈত্র ১২৭৯) নাটকের এবং পৌষ-সংখ্যায় 'গোরাই ব্রীজ' অথবা গৌরী সেতু' (১৮৭৩, পৌষ ১২৭৯) নামক পদ্যপুস্তিকার সমালোচনা বাহির হয়। মনে হয়, নাটকখানির সমালোচনা বঙ্কিম-চন্দ্র স্বয়ং এবং পদ্যপুস্তিকাখানির সমালোচনা অক্ষয়চন্দ্র করিয়াছিলেন।[৭] অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনা সুখপাঠ্য; তাঁহার 'কবি হেমচন্দ্র' (১৩১৮) নামক পুস্তিকাটি পড়িলেও ইহা প্রতীত হয়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় যেমন রূপ-রসের বিচার দেখা যায়, তেমনই পাওয়া যায় সাহিত্যের ইতিহাস। উদাহরণতঃ, ১২৮০ চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' বলা হয়

যে, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪) মহাশয়ের গ্রন্থ ('বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ১৮৭২-৭৩) প্রকাশের পূর্বে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) লিখিত হইয়াছিল।

১২৮০ ভাদ্রের বঙ্গদর্শনে শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগ' সম্বন্ধে বলা হয়:

> ইহার প্রথম খণ্ড 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনায় আমরা অক্ষম।··· কেননা যদি আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, তবে আমরা অপ্রশংসা করিতেই বাধ্য হইতাম।··· এই রূপ ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ গ্রন্থ আমরা অল্পই দেখিয়াছি।··· ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সুশিক্ষিত, আমরা অবগত আছি। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় তাঁহার ছাত্রেরা বিশেষ উপকৃত। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও একটু সতর্ক থাকিবেন—ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট। বিদ্যালয়ের চারি পার্শ্বে ইষ্টকাদি যেন পড়িয়া না থাকে।

১২৮০ কার্তিকের 'বঙ্গদর্শনে' রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) প্রণীত 'জয়দেব-চরিত' (১৮৭৩) গ্রন্থের সমালোচনা বাহির হয়; তাহার উপসংহারে বলা হয়:

> জয়দেবের মেলা অদ্যাপি হয়; তাহাতে বোধ হয় যে জয়দেব চৈতন্যের পূর্বে একজন ধর্মসংস্কারক ছিলেন, গৌরাঙ্গের বেগবতী বাহিনীতে তাঁহার স্রোত পরে মিশাইয়া গিয়াছে।

১২৮০ জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শনে' রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানব-দলন কাব্য' (১৮৭৩) সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে বলা হয়:

> তিনি (রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দঃ বীররস-প্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দঃ রামচন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলিয়া যে-সকল পদ্য প্রত্যহ সাধারণ সমীপে প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।

মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে'র বিষয় সুন্দ-উপসুন্দ-বধ, এবং রামচন্দ্র বাবুর 'দানব-দলন' কাব্যের বিষয় শুম্ভ-নিশুম্ভ-নিধন। উভয় কাব্যেই একটিও মনুষ্য নাই; কিন্তু উভয় কাব্যেই দানব-চরিত্র হইয়াছে মানব-চরিত্রের অনুকৃতি; সে জন্যেই "সে-সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না।" অসুরগণকে মানব-প্রকৃতি-বিশিষ্ট করিয়া অঙ্কনের কৌশল অবলম্বনে "রামচন্দ্র বাবু অনেকদূর কৃতকার্য হইয়াছেন" দেখিয়া সমালোচক 'বিস্মিত' হইয়াছেন।

১২৮০ পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮) প্রণীত 'মানস বিকাশ' কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। সেই সমালোচনা প্রবন্ধে বলা হয়:

> বঙ্গীয় গীতিকাব্য-লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য-হৃদয়কেই দৃষ্টি

> করেন।...প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। ...আধুনিক বাঙ্গালী গীতিকাব্য-লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতকবিদিগের অনুগামী। ...আধুনিক ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালী কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা-দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা-শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা-দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। কিন্তু 'অবকাশরঞ্জিনী'-র লেখক, এবং 'মানস-বিকাশ' লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। ...'মানস বিকাশ' অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। ...এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য, সন্দেহ নাই।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫২-১৮৯৪)-বিরচিত 'বঙ্গভূষণ' মহারাজা বল্লাল সেন হইতে মহাকবি মধুসূদন দত্ত পর্যন্ত ৬৭-জন বাঙ্গালী 'মহাত্মা'র উদ্দেশ্যে লেখা চতুর্দশপদী কবিতার সমষ্টি। তাহার সমালোচনায় ১২৮০ চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' বলা হয়:

> এই ৬৭-জনই যে 'মহাত্মা' বলিয়া স্মরণীয় হইবার যোগ্য, আমরা এমত বিবেচনা করি না। ইহার মধ্যে অনেককে আমরা চিনি না। কবিতাগুলিতে বিশেষ কবিত্ব নাই, কিন্তু পদবিন্যাসে ইংরেজি সনেটের মত হইয়াছে।

১২৮০ মাঘের 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীহরলাল রায়ের 'হেমলতা' নাটক এবং টাকীর জমীদার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'অমরনাথ' নাটকের সমালোচনা বাহির হয়। 'হেমলতা' সম্বন্ধে বলা হয়: "ইহা নাটক না হইয়াও অভিনয়যোগ্য।" (পরবর্তীকালে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল 'হেমলতা' কলিকাতার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।) 'অমরনাথ' সম্বন্ধে বলা হয়:

> নাটকখানি ২৯৪ পৃষ্ঠা। আমরা ইহা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। না পড়িয়া যে নিন্দা করিলাম না, এজন্য গ্রন্থকার বাধিত হইবেন।

১২৮০ চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীনিমাইচাঁদ শীল (১৮৩৫-৯৩: হুগলী কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী) প্রণীত 'তীর্থমহিমা' নাটকের প্রসঙ্গে বলা হয়: চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকায় নাটকখানির উৎসর্গ-পত্রের সমালোচনা বাহির হওয়ার পর তৎসম্পর্কে প্রবল বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, "এজন্য তীর্থ-মহিমার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না"।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসর বাহির হইয়া এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আবার বাহির হয়। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫২-১৯৩১) লিখিয়াছেন:

> নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি; আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।[৮]

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৮৫ বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র' নামে 'তুলনায় সমালোচনা' লেখেন; তাহাতে বলেন;

> কালিদাসের পুরূরবা, কালিদাসের শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের প্রস্পেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রস্পেরোর স্বভাব মনুষ্য-হৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।...
>
> বাহ্য-জগদবর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। সেক্ষপীয়র বাহ্য-জগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই; তিনি বাহ্য জগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্বতোমুখী। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনই বাহ্য জগতের উপর সর্বতোমুখী প্রভুতা।...
>
> অন্তর্জগতেরও এক অংশে কালিদাস সেক্ষপীয়র হইতে ন্যূন নহেন। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে বোধ করি, কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্বত্র সেক্ষপীয়র উপমা-বিরহিত।

বাঙলা সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনার প্রবর্তন কে করিয়াছেন, তাহা গবেষণার বিষয়।

১২৮৭ ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শনে' শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য' বিষয়ক বক্তৃতায় বলেন:

> চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের যে-সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।"

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) প্রণীত 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' (১২৮৮) সম্বন্ধে শ্রীহেমনাথ মিত্র তাঁহার 'ইংরাজ-শাসনে বঙ্গসাহিত্য' শীর্ষক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের 'চতুর্থ প্রস্তাবে' বলেন:

> তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' বঙ্গসাহিত্যে এক অতি আদরের —অতি গৌরবের সামগ্রী। ইউরোপীয় সমালোচকগণ কোন কোন স্থলে তাঁহার আদর্শ হইলেও, চন্দ্রনাথ বসু প্রথম শ্রেণীর সমালোচকদিগের পার্শ্বে সিংহাসন পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী।[৭]

১৩০৮ বৈশাখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সম্পাদনায় নব-পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' বাহির হয়। ১৩০৯ আশ্বিনে ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যক 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট নাটকের মিরান্দা-চরিত্রের সঙ্গে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের শকুন্তলা-চরিত্রের এই তুলনামূলক আলোচনা বাঙলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

১৩০৯ কার্তিকের 'বঙ্গদর্শনে' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনা বাহির হয়। সেই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে মূল লেখাটির শেষ দুইটি অনুচ্ছেদ নাই। সেই পরিবর্জিত অংশটি এই:

> শেষ করিবার পূর্বে 'কুসুমে কণ্টক' কবিতাটি সম্বন্ধে আমরা আপত্তি জানাইয়া রাখিতে চাই। ইহা বিশুদ্ধ কণ্টক মাত্র, ইহার মধ্য হইতে সুকোমল-সুন্দর কুসুমটিকে কই দেখা যাইতেছে। কবির নিকট হইতে আমরা এরূপ সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রত্যাশা করি নাই।
>
> 'রাধার প্রতি কৃষ্ণ' কবিতাটি এ-গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই।

১২৮০ শ্রাবণের 'বঙ্গদর্শনে' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রথম সর্গ 'মনোরাজ্য প্রয়াণ' প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহাতে লেখকের নাম ছিল না। এই রূপক কাব্যখানির প্রথম সংস্করণ ১২৮২ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০৩ সালে বাহির হয়। ১৩০৯ পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীসতীশচন্দ্র রায় দ্বিতীয় সংস্করণের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন :

> স্বপ্নপ্রয়াণ বাংলাদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা স্থির। কেন? ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, সহজ ভাষা ও গভীর সৌন্দর্যের অমূল্য মাহাত্ম্য অনেকেরই তখন অধিগম্য ছিল না। কিন্তু আরও কারণ থাকিতে পারে। সে হচ্ছে এই যে, স্বপ্নপ্রয়াণ রূপক। রূপক ব্যক্তিত্বের সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায় না, সে মনোরাজ্যের সুদূর গুহায় ভিত্তি পাতিত করে।··· পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইলেও, স্বপ্নলোকে প্রয়াণ করিবার শক্তি সকলেই রাখে না।

সমালোচক এখানে সাধারণ পাঠকের অক্ষমতার বিষয়ই বলিয়াছেন, কিন্তু কাব্যখানির দোষ ও দুর্বলতা কিছুমাত্র বিচার করেন নাই। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' জনপ্রিয় না হওয়ার বড় কারণ, ইহাতে সাধুভাষার শব্দের মাঝে সহসা দেশজ শব্দের নির্বিচার প্রয়োগ ভাবের প্রকাশ করিয়াছে প্রায়শঃ লালিত্যহীন, এবং উচ্ছৃঙ্খলরূপে পদবিন্যাসের দরুণ ছন্দগতি হইয়াছে অনেক স্থলে আড়ষ্ট ও গীতঝঙ্কারহীন। নিম্নে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি :

অচেতন চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়, অন্ধে আঁখি পায়
ঐশ্বর্যে ফাঁপিয়া ওঠে দরিদ্র অভাগা॥

ছায়ারূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনোমন্দিরে খুলি দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে দেখিতে, অমনি চকিতে
আলোকের পথ দিয়া রথ এল নাবি॥

এখানে 'জাগা', 'আগা' ও 'নাবি' শব্দের ব্যবহারে ভাষার সাবলীলতা বিনষ্ট হইয়া কাব্যের অবয়ব করিয়াছে লাবণ্যহীন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, আট অক্ষরের-পদক্ষেপেই পয়ারের প্রকৃত 'পদমর্যাদা'।[১০] উপরোদ্ধৃত উদাহরণের প্রথম ও পঞ্চ পংক্তি ৭+৫ অক্ষরের এবং দ্বিতীয় পংক্তি ৬+৬+৬ অক্ষরের পদক্ষেপে গঠিত হওয়ায় পয়ারের স্বাভাবিক ছন্দসঙ্গীত বিঘ্নিত হইয়াছে। ভাব-প্রকাশের এই দুর্বলতাই হইয়াছে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' জনপ্রিয় হওয়ার পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা হইয়াছে সর্বাধিক। শ্রীহেমনাথ মিত্র তাঁহার পূর্বোক্ত 'ইংরাজ-শাসনে বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসুর 'কাব্যসুন্দরী' (১৮৮০) নামক সমালোচনা গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন :

> 'কাব্যসুন্দরী'তে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস-বর্ণিত সুন্দরীগণের মধ্যে কয়েক জনের চরিত্র সমালোচিত হইয়াছে। পূর্ণবাবু একজন বিখ্যাত সমালোচক। বঙ্কিমবাবুর প্রণীত স্ত্রীচরিত্রগুলির সৌন্দর্য তাঁহার দ্বারা দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে।[১১]

৫—

১৩০১ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'দ্বিতীয় প্রস্তাবে' শ্রীশচন্দ্র বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'রাজসিংহ' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।[১২] রবীন্দ্রনাথের লেখা 'রাজসিংহ' ১৩০০ চৈত্রে, 'বঙ্কিমচন্দ্র' ১৩০১ বৈশাখে ও 'কৃষ্ণচরিত্র' ১৩০১ মাঘ-ফাল্গুনে 'সাধনা'-য় প্রকাশিত হয়। এই তিনটি লেখাই তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। প্রথম লেখাটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১২৮৮ সাল) উপন্যাসের সমালোচনা ; রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বলিয়াছেন :

> রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে। ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতা পুরুষ,—উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা।…
>
> জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে, কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই ; সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।…
>
> জেবউন্নিসা সম্রাট্‌প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্তজগৎবাসিনী রমণী।

উপন্যাসের এরূপ সূক্ষ্ম সমালোচনা ও মূল্য-নিরূপণ বাঙলা সাহিত্যে দ্বিতীয় নাই।

গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৬২-৯৮) প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' তিন ভাগ (১২৯৩ সাল, ১২৯৭ সাল ও ১৩০৩ সাল) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে তথ্যবহুল রচনা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ১৩১৬ ও ১৩১৭ সালের 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'গিরিজা প্রসন্ন শিরোনামে' ধারাবাহিকরূপে কয়েক কিস্তিতে একটি নাতিহ্রস্ব আলোচনা লেখেন ; তাহার শেষ কিস্তিতে বলেন :

> বিগত ১৩০৩ সালে 'বঙ্কিমচন্দ্র' ৩য় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই ভাগে আনন্দ-মঠ, সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণী বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গিরিজা প্রসন্ন এই তিনখানি উপন্যাসকে বঙ্কিমবাবুর অন্যান্য উপন্যাস অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিয়াছেন।[১৩]

ইহাতে মনে হয় যে, গিরিজাপ্রসন্ন একটা বিশেষ আদর্শ-আচ্ছন্ন সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন। এরূপ বিচারের প্রতিবাদী বিচার দেখা যায় তসলিমউদ্দীন আহমদের 'হিন্দু সাহিত্য : মুসলমান নায়িকার হিন্দু নায়ক' শীর্ষক সমালোচনায়,[১৪] এস্. এম্. আকবরউদ্দীনের 'বর্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের স্থান' শিরোনামীয় সুদীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধে,[১৫] আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের 'সাহিত্য-গুরুর বাঙ্গালী-প্রীতি' নামক ইতিহাসাশ্রয়ী আলোচনায়,[১৬] এবং ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৫২-১৯৩০) প্রণীত 'জ্ঞানভাণ্ডার' (১৯২৪) পুস্তকে। বলা বাহুল্য যে, এ-সকল সমালোচনায় সাহিত্যের রসসৌন্দর্য ও শিল্পরূপ বিচারের ধর্ম-নিরপেক্ষ ও নীতিনিরপেক্ষ উদার দৃষ্টি এবং সুস্থ ও নিরাসক্ত মনের সাক্ষাৎ বিশেষ মিলে না,—ধর্মসংস্কারের মোহ ও আদর্শবাদিতার রঙিন চশমা দিয়া জীবন ও সাহিত্যকে দেখার প্রবণতাই এগুলিতে প্রবলতর। তৎকালে নির্মোহ ও নিরপেক্ষ শিল্পসম্মত

বঙ্কিম-সমালোচনা দেখা যায় ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমানের রচনাগুলিতে। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তাঁহার অকালপ্রয়াণে 'মিহির ও সুধাকর' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন :

> তিনি (ডাক্তার মহম্মদ হবিবর রহমান) এক সময়ে মাসিক 'মিহির'-এ ধারাবাহিকরূপে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়া মুসলমান বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।[১৭]

রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ সংখ্যা হইতে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ সংখ্যা পর্যন্ত 'মিহির'-এ মোহাম্মদ হবিবর রহমান ধারাবাহিকরূপে 'চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম' নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন। তিনি 'চন্দ্রশেখরে'র দলনী ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা, এই দুই নারী-চরিত্রের তুলনা করিতে গিয়া বলেন :

> দলনী-অর্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপ-কুসুম; আয়েষা পূর্ণবিকশিত, মধুপূর্ণ শতদল। এই রমণী-চরিত্রদ্বয়ের মূল উপাদান প্রেম।----দলনী ও আয়েষা, প্রণয়-চিত্রের দ্বিবিধ রূপ লইয়া গঠিত। দলনীতে ধীর-স্থির ভয়-ভক্তি-উদ্দীপক গম্ভীর ভাব; আয়েষায় তাহার উচ্ছ্বসিত চঞ্চলোন্মুখ সুমধুর প্রশান্ত ভাব পাওয়া যায়। দলনী মিলন-বিরহময়ী যুবতী, আয়েষা নিরাশ-প্রেমিকা তরুণী।

মোহাম্মদ হবিবর রহমান তাঁহার 'ওসমান ও জগৎসিংহ' প্রবন্ধের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য লিপিনৈপুণ্য ও অঙ্কন-ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া বলেন :

> তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রায়ই মুসলমান-রাজত্বের ঘটনাসমূহের উপর সংস্থাপিত। কিন্তু ইতিহাসের সহিত মূল ঘটনার সংশ্রব থাকিলেও কবি-কল্পনার ঐন্দ্রজালিক তুলিকা দ্বারা তাহা এমনি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করিতে যাইয়া আমরা ইতিহাসের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই, কেবল উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের সহিত পরিচিত হইয়া কখনও হর্ষে গদ্‌গদ, বিস্ময়ে অভিভূত, অথবা দুঃখে ম্রিয়মাণ হই।----
>
> বঙ্কিমবাবু যে-চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা জীবন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। চিত্রকর-অঙ্কিত চিত্র আর কবির কল্পনা-উদ্ভাসিত মানস-প্রতিমা উভয়ের সার্থকতা তখনই প্রতিপন্ন হয় যখন তাহা দর্শক ও পাঠকের মন হরণ করে। চিত্রকর স্বীয় অঙ্কিত চিত্রে শেষ রেখাপাত (finishing touch) করিয়া যেমন তাহাকে জীবন্তবৎ করিতে সক্ষম হন, বঙ্কিমবাবুও তাঁহার সুনিপুণ কল্পনা-সাহায্যে ঘটনার পর ঘটনার অবতারণার দ্বারা তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে সেইরূপভাবে জীবনদান করিয়াছেন। আমরা যখন তাহাদের সহিত পরিচিত হই, তখন ইহা ভাবিতে পারি না যে, ইহারা আমাদের হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।----

এহেন অসাধারণ প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা তাড়িত হওয়ায় তাঁহার অঙ্কিত অনেক চরিত্র কিরূপে সুবিকশিত হইতে পারে নাই, কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন ও খণ্ডিত হইয়া কিরূপে সুউচ্চ শিল্পাদর্শের অপহ্নব ঘটাইয়াছে, তাহা তিনি সুন্দররূপে আশ্চর্য-গভীর রসবোধ-সহকারে পর্যালোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটিতে সাহিত্য-বিচারের যে-আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, তাহা শালীন রুচি ও উন্নত চিৎপ্রকর্ষের পরিচায়ক। সুমার্জিত ও সাবলীল ভাষা সংযত ও সুঠাম বাক্‌ভঙ্গী

এবং নির্মোহ ও নিরাসক্ত শিল্পদৃষ্টির দৌলতে মোহাম্মদ হবিবর রহমান বাঙলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর সমালোচকের আসন লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের পরে 'ভারতী' (১৮৭৭) সাহিত্য-সমালোচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ১২৮৯ সালের শ্রাবণ-সংখ্যক 'ভারতী'তে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) তাঁহার 'মেঘনাদবধ-কাব্য' শিরোনামীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

> কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত করিয়া আমাদের সাহিত্য-রাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব সংসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতা সাধন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব আর যদি কিছুরই জন্য না হয়, অন্ততঃ এই উপকারটির জন্য তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

১২৮৯ ভাদ্রের 'ভারতী'তে ''মেঘনাদবধের নির্মমতম সমালোচক বালক রবীন্দ্রনাথ'' তাঁহার 'মেঘনাদবধ-কাব্য' শীর্ষক সমালোচনায় বলেন :

> মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটা কতক দীন-দরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতালা লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন।[১৮]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও কাব্য সম্বন্ধে এরূপ বিরূপ সমালোচনা করেন বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৭-১৯২৫), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), 'দাসী' ও 'আর্যাবর্ত' সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২), 'নারায়ণ' সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'চৈতালি' কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'চৈতালি' কাব্যের 'অনাবৃষ্টি' কবিতাটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন :

> ইহাতে জাতির দুর্দশার একটি কথা নাই, জাতির বেদনায় সহানুভূতি নাই, জাতির প্রধানতম দুর্গতিতে একটু করুণার চিহ্নও নাই। যে জননী জন্মভূমি প্রকৃতই স্নেহময়ী জননীর মতো স্নেহতপ্ত ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দিয়াছেন, সেই জন্মভূমির প্রতি আমাদের ভক্তি বা ভালোবাসা কিছুই নাই।[১৯]

১৩১১ শ্রাবণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি 'গান' সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা'য় বলা হয় যে, তাহা ''সম্পূর্ণ অর্থহীন'' এবং ''সাহিত্যের পক্ষে নিতান্ত অপকারী।''[২০]

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচনা করেন 'আনন্দ-বিদায়' নাটক; কলিকাতার স্টার থিয়েটারে উহার অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হইয়াছিল।[২১] 'আনন্দ-বিদায়' রচনার যুক্তি দেখাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন :

> যদি কোন কবি কোন কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য।

রবীন্দ্র-কাব্যের বিচার করিতে গিয়া হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মানবিকতা ও দেশপ্রীতির কথা তোলেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার অর্থহীনতা ও অপকারিতার কথা বলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহিত্যের মঙ্গলের প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

ফজলুর রহমান খাঁর 'সিটী কলেজে শিবাজী' (মিহির ও সুধাকর, ২১শে কার্তিক, ১৩০৯) এবং 'মহাশ্মশান কাব্য' (নবনূর, মাঘ, ১৩১২), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক' (ইসলাম-প্রচারক, অগ্রাহয়ণ-পৌষ, ১৩১০),[২২] কাজী ইমদাদুল হকের 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য' (ভারতী, বৈশাখ ১৩১০), 'শিবাজী ও সাজাদী রোসিনারা' (নবনূর, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০) এবং 'গ্রাণ্ড থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য' (নবনূর, আশ্বিন, ১৩১২), সৈয়দ এমদাদ আলীর 'দুর্গাদাসে আওরঙ্গজেব' (নবনূর, পৌষ, ১৩১৩), আবদুল মালেক চৌধুরীর 'আলোচনার আলোচনা' (আল্-এসলাম, পৌষ, ১৩২৬), মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'শরৎচন্দ্রের নূতন ভাব' (মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৪৩) প্রভৃতি প্রবন্ধে সাহিত্যের উপকরণ ও আঙ্গিকের বিচার প্রসঙ্গে জাতীয় মাহাত্ম্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবিক মঙ্গল ও শৈল্পিক নিরাসক্তির প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যবোধ, পরিশীলিত বিচার-বুদ্ধি, শাণিত বচন ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লইয়া বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয় প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' (প্রথম প্রকাশ : ১৫ই বৈশাখ ১৩২১)। প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যাদর্শের বিরোধীদের মুকাবিলা করিতেই এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য তাহার পূর্বেই প্রিয়নাথ সেন যে-সকল সমালোচনা-প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলিতে আছে বৈদগ্ধ্য ও বিচারবুদ্ধির অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন বলিয়াছেন :

> বঙ্কিম-যুগশেষের বৈদগ্ধ্যের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথের যৌবন-বন্ধু, শ্রীহর্ষ হইতে রাস্‌কিন পর্যন্ত 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন। গদ্যরচনায়, বিশেষতঃ সাহিত্য-সমালোচনায়, তখন খুব কম লেখকই প্রিয়নাথের সমকক্ষ ছিলেন।[২৩]

ইংরেজী সাহিত্যে ম্যাথু আর্নলড যেমন একাধারে কবি ও সমালোচক, বাঙলা সাহিত্যে তেমনই প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), শশাঙ্ক মোহন সেন (১৮৭২-১৯২৯), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ও বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ (১৯০৮-৭৪) একাধারে কবি ও সমালোচক। সাম্প্রতিক কালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬৪) বিষ্ণু দে (জ. ১৯০৯) প্রতিভাধর কবি-রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের সমালোচনা-প্রবন্ধের সংখ্যা সামান্য হইলেও তাঁহাদের বক্তব্যের গুরুত্ব অল্প নহে।

'সবুজপত্র' উচ্চাঙ্গ সমালোচনার যে-উৎকৃষ্ট আদর্শের প্রবর্তন করে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (প্রথম প্রকাশ : ১লা শ্রাবণ, ১৩৩৮) পত্রিকায় তাহার কালোচিত বিকাশ বাঙলা সাহিত্যের এই বিভাগে করিয়াছে নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি। অভিজাত 'পরিচয়' পত্রিকায় 'পুস্তক পরিচয়' লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র দত্ত, মুনীন্দ্রলাল বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, কাজী আবদুল ওদুদ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, পশুপতি ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলচন্দ্র দত্ত, লীলাময় রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদির, শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ, শ্যামাপদ চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বুদ্ধদেব বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত,

বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতি। উক্ত ঐতিহ্যের সীমিত অনুসরণ 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ', 'পূর্বাশা,' 'সাহিত্য-পত্রিকা' প্রভৃতিতে দেখা গিয়াছে।

শ্রী বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় 'মাইকেল' প্রবন্ধে বলেন :

> মেঘনাদবধ-কাব্য নিষ্প্রাণ।··· মেঘনাদবধ-কাব্য একটা হয়ে-ওঠা পদার্থ নয়, একটা বানিয়ে-তোলা জিনিশ।··· মাইকেলে শুধু আঁকাড়া অনুকরণ।... মেঘনাদবধ-কাব্য দৃষ্টিহীন গতানুগতির একটি অনবদ্য উদাহরণ।·· মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেন নি।···মুহর্‌রমের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনার কথাও তাঁর মনে এসেছে, কিন্তু যীশুর জন্ম নিয়ে কখনোই নয়।[২৪]

প্রকৃত সমালোচনার জন্যে প্রয়োজন যে পরমা অনাসক্তি, এখানে তার একান্ত অভাব। বুদ্ধদেব বসু প্রভূত বিদ্যাবত্তা সত্ত্বেও এখানে করিয়াছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উদগ্র সাগ্‌রেদি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছিলেন :

> মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই থামলেন, বুঝলেন না যে, ভাষা প্রাকৃত না হলে প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব।·· এমন সন্দেহ হয়ত অনুচিত নয় যে, মাইকেল বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না ; তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবক মাত্র, ত্রাণকর্তা নন।[২৫]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নিজের কাব্যভাষা কতখানি 'প্রাকৃত', তাহার পরিমাপ করিয়া তাঁহার রচনার মূল্যায়ন করিলে কবি-সভায় তাঁহার আসন লাভ 'অসম্ভব' হইয়া ওঠে। দুর্বোধ্য তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রতি তাঁহার আগ্রহ মধুসূদনের অপেক্ষাও প্রবলতর। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যভাষা সমাসবহুল সাধু হইলেও তাঁহার প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ তাঁহার কবিতায় সঞ্চার করিয়াছে সচ্ছন্দ গতি; পক্ষান্তরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আবেগ সংযত হওয়ায় তাঁহার কবিতায় গতিশীলতা তাঁহার দুরূহ ভাবের ঊষর উপলে পদে পদে প্রতিহত।

টি. এস্. এলিয়ট ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে বলেন : Milton writes English like a dead language. His language is artificial and conventional. তিনি মিল্টনের স্থান নিরূপণ করিতে গিয়া The tradition of conversational language in poetry সংরক্ষণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই একই ধরনের কথা বলিয়া মধুসূদনের কাব্যের বিচার অন্ধ পরানুকৃতিরই লক্ষণ। একালের বাঙলা সমালোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এরূপ নির্বিচার অনুসরণ বহু স্থলে হইয়াছে বিভ্রান্তিকর।

আমরা দেখিয়াছি যে, গোড়ার দিকে বাঙলা সাহিত্যের মুসলমান সমালোচকেরা বহু ক্ষেত্রে বিচলিত হইয়াছেন কোনও কোনও হিন্দু লেখকের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির মুকাবিলায়।[২৬] সেই প্রথম পর্বেও শেখ আবদর রহিম-সম্পাদিত 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' কাব্য, মোজাম্মেল হকের 'হজরত মোহাম্মদ চরিতাবৃত্ত' কাব্য, শেখ ওসমান আলীর 'দেবলা' কাব্য (১৯ কার্তিক, ১৩০৮) এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর 'ঈদল্-আজহা' (১লা ফাল্গুন, ১৩০৯) ; মোহাম্মদ রেয়াজ-উদ্দীন আহমদ-সম্পাদিত 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় মোল্লা খোদা দাদ খান্ বাহাদুরের 'মোনাজাত' কাব্য (বৈশাখ, ১২৯৯), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল-প্রবাহ' কাব্য (বৈশাখ, ১৩০৭) ও আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর 'ভ্রাতৃবিলাপ' কাব্য (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০) ; সূফী মধু মিঞা-সম্পাদিত 'প্রচারক' পত্রিকায় কাজী

ইমদাদুল হকের 'আঁখিজল' কাব্য (বৈশাখ, ১৩০৭) ও আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর 'উদাসী' কাব্য (আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩০৮) ; মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত কবিতাময়ী পত্রিকা 'লহরী'তে শেখ ফজলল করিমের 'তৃষ্ণা' কাব্য ; সৈয়দ এমদাদ আলী-সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায় নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর 'শৈশব-কুসুম' কাব্য (আশ্বিন, ১৩১০), মোজাম্মেল হকের 'হজরত মোহাম্মদ' কাব্য (মাঘ ১৩১০), মীর মশাররফ হোসেনের 'মৌলুদ শরিফ' কাব্য (শ্রাবণ, ১৩১১), শেখ ওসমান আলীর 'অলোক-সভা' কাব্য (আশ্বিন, ১৩১১), শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ' কাব্য (কার্তিক, ১৩১১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' (ভাদ্র, ১৩১২), আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর 'কাসেম বধ-কাব্য' (অগ্রহায়ণ, ১৩১২) ও সৈয়দ আবুল হোসেনের 'যমজ ভগিণী কাব্য' (কার্তিক, ১৩১৩) সম্বন্ধে যে-সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে নির্মল সাহিত্যবোধের পরিচয় তৎকালীন পাঠক-সমাজের সৌন্দর্য-তৃষ্ণা ও রস-জিজ্ঞাসা প্রভূত পরিমাণে পরিতৃপ্ত করে।

মোহাম্মদ হবিবর রহমানের পরে নির্ভরযোগ্য সমালোচকরূপে বৃহত্তর দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একরামদ্দিন (১৮৮০-১৯৩৫) ও কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। একরামদ্দিনের 'রবীন্দ্র-প্রতিভা', 'মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল-এ বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র' বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চ মর্যাদা লাভের দাবী রাখে। নিরপেক্ষ সমালোচকের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-সন্ধানী দৃষ্টি ও রসপিপাসু প্রসন্ন হৃদয় লইয়া তিনি সমালোচনা-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন ; তাঁহার সাহিত্য-বীক্ষায় ব্যক্তিগত সংস্কার বা আদর্শজাত মোহের পরিচিহ্ন নাই। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদের সমাজ-সচেতনতা তাঁহার সাহিত্য-চিন্তাকে বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর করিয়াছে। তবে তাঁহার 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের গান' প্রভৃতি প্রবন্ধে নিস্তরঙ্গ নির্মল নিগূঢ় সাহিত্য-রসের আস্বাদন পাঠক-মনে দেয় অনির্বচনীয় আনন্দ। তাঁহার 'রবীন্দ্র কাব্য পাঠ', 'কবিগুরু গ্যেটে', 'নজরুল-প্রতিভা', 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'শরৎচন্দ্র ও তার পর' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মেণীর মহাকবি গ্যেটে সম্বন্ধে আলোচনা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই হইয়াছে ; গ্যেটে-সাহিত্যের সে-সকল আলোচনায় কাজী আবদুল ওদুদের 'কবিগুরু গ্যেটে' প্রথম পর্যায়ে স্থান লাভের উপযুক্ত।[২৭]

রবীন্দ্র-যুগেই হইয়াছে বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের আশাতীত বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনার প্রকৃত পথ নির্দেশক অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)। তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯১২) ও 'কাব্য-পরিক্রমা' (১৯১৪) একালেও বহুল-ব্যবহৃত। শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী', 'বাণী-মন্দির' ও 'মধুসূদন' ; প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ভারতাত্মা কবি কালিদাস' ও 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা' ; আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ'; অমলেন্দু বসুর 'সাহিত্যলোক' ; মুনীর চৌধুরীর 'তুলনামূলক সমালোচনা' প্রভৃতি পুস্তকে শিল্পসচেতন নিপুণ সাহিত্য-সমালোচনার যে-শালীন আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, তাহাই অধুনা এদেশের পাঠ-কমহলে সর্বাধিক অভিনন্দিত। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-রূপ পর্যবেক্ষণের প্রয়াস এখনও এখানে প্রায় অনুপস্থিত। এখানে সমালোচনা-শৈলীর উত্তম নিদর্শন দেখা যায় প্রধানতঃ পুস্তক-পরিচয়ে,—একটি মূল বিষয় লইয়া লেখা পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা-পুস্তক কমই প্রকাশিত হইয়াছে ; সেরূপ প্রামাণ্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পরিবেশিত হয় সাধারণতঃ ডক্টরেট পদবী-লাভের জন্যে অভিসন্দর্ভ-রূপে। এ-যাবত উল্লেখযোগ্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে সাময়িকপত্রে। গোলাম মোস্তফার 'আনোয়ারা' (বঙ্গীয় মুসলমান

সাহিত্য-পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৬), আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীনের 'মহাশ্মশান কাব্য' (সওগাত, আষাঢ়, ১৩২৬), আবুল হুসেনের 'শেখ আন্দু' (সহচর, চৈত্র, ১৩২৮), সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-বিলাস' (শিখা, ১৩৩৮), কাজী মোতাহার হোসেনের 'রমলা' (জয়তী, কার্তিক-পৌষ, ১৩৩৮), কাজী নজরুল ইসলামের 'বিশ্বসাহিত্য' (প্রাতিকা, ১৩৩৮), কাজী আবদুল ওদুদের 'আবদুল্লাহ্' (বুলবুল, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪১) প্রভৃতি প্রবন্ধ এক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শনের মর্যাদা লাভের উপযোগী।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার বহুবিচিত্র ধারা সম্পর্কে বিস্তারিতরূপে পর্যালোচনা করিয়া বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনার উদ্যোগ নবীন গবেষকগণ গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সামগ্রী ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে, সাহিত্যের সকল শাখার ভাবনা-কল্পনার উদ্‌গম এবং রীতি-প্রকৃতির বিকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও কৌতূহল যেমন বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই পরিতৃপ্ত হইবে আমাদের আনন্দ-ক্ষুধা ও জীবন-জিজ্ঞাসা।

পাদটীকা

১ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', তৃতীয় খণ্ড, আষাঢ় ১৩৪২ সন, পৃ. ২৪৬-৪৭

২ 'সাহিত্যিকী', বসন্ত সংখ্যা, ১৩৭১ সন, পৃ. ৮৯

৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'গদ্য-পদ্য' (প্রথম সংস্করণ, ১৮৭৮ খ্রী.) পুস্তকের 'আকবর শাহের খোষরোজ' শীর্ষক পদ্যটি রঙ্গলালের 'শূর-সুন্দরী' কাব্যের ভাবানুসরণে বিরচিত। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের পরিণাম উল্লেখ করিয়া শ্রীরসিকচন্দ্র গুহরায়ের 'শবাসনা' গ্রন্থ সম্পর্কে ১৩০৮ সালের ২৯শে কার্তিক শুক্রবারের 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় 'শবাসনা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধের সূচনায় বলা হয়:

> রঙ্গলালের রঙ্গভঙ্গী, হেমচন্দ্রের হেমকুম্ভ, নবীনচন্দ্রের নবনীত, এ-সমুদয়ই একত্রে মুসলমানদের অন্তঃকরণে তীক্ষ্ণ শেল চিরকালের জন্য প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।

৪ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন-চরিত ও কবিত্ব' নামক পুস্তিকায় বলিয়াছেন যে, "অশ্লীলতা তাঁহার (ঈশ্বর গুপ্তের) কবিতার এক প্রধান দোষ।"

৫ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৭

৬ 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

৭ 'জমীদার দর্পণ নাটক' সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনের' সমালোচনায় বলা হয়:

> জমীদারদিগের অত্যাচারের উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত 'নীলদর্পণে'র যে-উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।...আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ-সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।...

ইহার পরে 'গ্রেট বারবার্‌স্ ড্রামা': 'নাপিতেশ্বর নাটক' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:

> নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন।...

৮ 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', ১৬০ পৃষ্ঠা। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনা' পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ : 'বাঙ্গালা ভাষা' ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত একটি ছাত্র-পাঠ্য 'সমালোচনা-সংগ্রহে' এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের নামে প্রচারিত হইয়াছে।

৯ 'নব্যভারত', আষাঢ়, ১২৯৫ সাল; পৃ. ১৬৩

১০ 'ছন্দ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, পৃ. ৪৪০

১১ 'নব্যভারত', আষাঢ়, ১২৯৫ সাল; পৃ. ১৬৫

১২ 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ২০৯

১৩ 'নব্যভারত', অষ্টাবিংশ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৭ সন; পৃ. ২৩২

১৪ 'ইসলাম-প্রচারক', আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০ সন। সেই প্রবন্ধে প্রধানতঃ 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের আয়েষা-চরিত্র এবং প্রসঙ্গতঃ 'রোশিনারা' নাটকের রোশিনারা ও 'মাধবী-কঙ্কণ' উপন্যাসের জেলেখা চরিত্র পর্যালোচিত হইয়াছে। সমালোচক বলিয়াছেন :

> দুর্গেশনন্দিনীর লেখক অতি অনুদার। তিনি ওসমানকে বহু গুণে ভূষিত করিয়াও কলঙ্কিত এবং অবমানিত করিয়াছেন। তিনি আয়শাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী করিয়াও ঘৃণার ভাজন করিয়াছেন। তিনি কৎলু খাঁকে পাঠান-রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াও নৈতিক ধনে অতি কাঙ্গাল করিয়াছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' (১৮৬২) বাঙলা ভাষার প্রথম ইতিবৃত্তমূলক উপ-ন্যাস; তাহাতে মারাঠা-নায়ক শিবাজীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী আওরঙ্গজেব-দুহিতা (?) রোসিনারা। তাহারই অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন বাঙলা ভাষায় তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫); তাহাতে শিবাজীর স্থলে জগৎসিংহ এবং রোসিনারার স্থলে আয়েষা চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে ভূদেবের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' উপন্যাসের বিষয়-কল্পনা ও চরিত্র-চিত্রণ হুবহু নকল করিয়া কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর উপন্যাস 'রশিনারা' (১৮৬৯), যশোদা-নন্দন সরকারের কাব্যনাটিকা 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' (১৮৯৫) ও মনোমোহন গোস্বামীর নাটক 'রোশিনারা' (১৯০১) রচিত হয়। ইতিহাস-কাহিনীর অনুবাদক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'ঔরঙ্গজেব' (১৩১১ সাল) নাটকের বিষয় জানি না; তবে ১৩০৯ মাঘের 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে বলা হয় :

> "আজকাল হিন্দু লেখকগণের মুসলমান নায়িকা গ্রহণ না করিলে কল্পনা দেবী ঘটে নাবেন না। ···যে হরিসাধন বাবু, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অসূর্যম্পশ্যরূপা পবিত্র-হৃদয়া পরম ধার্মিকা কন্যা কুমারী জেবুন্নেসাকে পাষণ্ড দস্যুরাজ শিবাজীর প্রণয়াসক্তা বলিয়া প্রচারিত করিতে পারেন,"— ইত্যাদি।

১৫ 'আল্-এস্লাম', ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৩ সন ('আনন্দমঠ' ও 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সমালোচনা), জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সন ('সীতারাম' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'-র সমালোচনা)।

১৬ 'আল্-এস্লাম', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ও অগ্রহায়ণ ১৩২৫ সন।

১৭ 'মিহির ও সুধাকর', ২৩শে মাঘ, ১৩০৯ সন। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন মৎলিখিত প্রবন্ধ : 'সাহিত্য-সমালোচক মহম্মদ হবিবর রহমান', 'মাসিক মোহাম্মদী', ২৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৫ সাল।

১৮ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', অচলিত সংগ্রহ : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৮

১৯ 'দাসী', ডিসেম্বর, ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ।

২০ 'সাহিত্য', কার্তিক ১৩১১ সন।

২১ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, ''বীরবলের হালখাতা'', 'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধ, মাঘ ১৩১৯ সন।

২২ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁহার 'মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক' প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষ' বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন; পরে সেই প্রস্তাবটির বিবৃত বিষয় ইংরেজীতে 'ভার্নাকুল্যার এডুকেশন ইন্ বেঙ্গল' (Vernacular Education in Bengal) নাম দিয়া পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা হয়। সেই পুস্তিকাটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ১৩০৭ কার্তিকের 'ভারতী'তে বলেন:

> সৈয়দ সাহেব বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে মুসলমান বিদ্বেষের যে-উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত মনে করি। বঙ্কিমবাবুর মতো লেখকের গ্রন্থে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয়, কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব।

২৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩-৪

২৪ 'কবিতা', দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৩ সন; পৃ. ১৩৪-১৪৫

২৫ 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ; ''কুলায় ও কালপুরুষ'', ৪১ পৃষ্ঠা। টি. এস্. এলিয়ট তাঁহার **A** note on the verse of Milton (1936) প্রবন্ধে মিল্টনের কাব্যভাষা ও কবি-ভূমিকা সম্পর্কে এ-ধরনের উক্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে MILTON বিষয়ক বক্তৃতায় তিনি তাঁহার সেই অর্বাচীন অভিমতের সম্পূর্ণ সংশোধন করেন। MILTON Two Studies : T. S. Eliot দ্রষ্টব্য।

২৬ 'মিহির ও সুধাকর', 'ইসলাম-প্রচারক' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে কোনও কোনও মুসলমান লেখকের মনোভাবের বিরুদ্ধেও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। উদাহরণতঃ মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর সম্পাদিত 'কোহিনূর' (প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩০৫) পত্রিকার ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলী ''অতীত ইতিহাসের মুসলমান বিচারক'' নামক প্রবন্ধে সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্পর্কে যে-কটূক্তি করেন, তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া ১৩০৭ সালের ৮ই আষাঢ়ের 'মিহির ও সুধাকর' এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন:

> যজ্ঞেশ্বরের 'রাজস্থান'-এর চর্বিত-চর্বণ-প্রয়াস, লেখকপ্রবর সৈয়দ সাহেবকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন কোনও জাতীয় প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, মুসলমানের লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধসমূহ অর্ধশিক্ষিত মুসলমান-গণ সহজেই বিশ্বাস করিবে এবং বিজাতীয় ভ্রাতাগণের নিকট তাহা 'নজির'-রূপে গৃহীত হইবে।···

১৩০৯ সালের মাঘ সংখ্যক 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, বি.এল্, ও মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক এম.এ., বি.এল্, সম্পাদিত 'ভারত-সুহৃদ্' পত্রিকার কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত সৈয়দ এমদাদ আলীর 'আকবর ও আওরঙ্গজেব' প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়:

> সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব আকবর ও আরওঙ্গজেবের দোষ-গুণ বিচার করিতে গিয়া 'আওরঙ্গজেব কেবল মুসলমানেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন' ইহা প্রতিপন্ন করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ তাঁহার সাহায্য হইতে কেন বঞ্চিত হইল, সে-বিষয়ও আলোচনা করিলে ভালো হইত।

এ-সকল সমালোচনার ফলে সৈয়দ এমদাদ আলীর চিন্তাপ্রবাহে ঘটে আমূল পরিবর্তন,— তিনি সম্রাট আকবরের (তথা জাতীয় ঐক্যের) আদর্শের স্থলে অবলম্বন করেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের (তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শ) আদর্শ।

২৭ ''কবিগুরু গ্যেটে'' প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশ 'জয়তী', 'ছায়াবীথি' ও 'শীশ মহল' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।